বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এবং আগামী দিনের বাংলাদেশ

নজরুল ইসলাম

উপক্রমণিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সকলকে অভিনন্দন ও শুভেছা। যে মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ হয়েছেন, এবং আহত হয়েছেন; যে বোনেরা নির্যাতিত হয়েছেন; যাঁরা অন্যান্যভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন – তাদের সকলকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা। যে ধরণের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য তাঁরা প্রয়াসী হয়েছিলেন, সে ধরণের বাংলাদেশ গড়ে তোলাই হোক আমাদের আজকের অঙ্গীকার।

প্রথমেই আমি মুক্তধারাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বার্ষিক বক্তৃতার আয়োজন করার জন্য এবং আমাকে তার প্রথম বক্তৃতাটি দেয়ার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। এ বছরটি আমাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বের, কারণ এ বছর আমরা লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী পালন করছি; এবং তা করছি ২০২০ সনের পটভূমিতে, যে বছর আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করেছি। সে কারণে উদ্যোক্তারা এ বক্তৃতার যে বিষয়বস্তু ঠিক করেছেন, তা খুবই যথার্থ। “বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন” এবং “আগামী দিনের বাংলাদেশ” – এদু’টি কথা আমি নিজে ১৯৯৭ সন থেকে শুরু করে অনেকবার ব্যবহার করেছি। সুতরাং, আজকের বক্তৃতার শিরোনামেও তা ব্যবহৃত হতে দেখয়ে আমি আনন্দিত।

দ্বিতীয়ত, যে বিশিষ্ট গবেষকেরা এই বক্তৃতার উপর আলোচনা করতে রাজী হয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁরা এই বক্তৃতার অনেক বিষয় নিয়ে আমার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান রাখেন; তাদের সেই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শোনার জন্য আমি উদগ্রীব।

তৃতীয়ত, অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে এই বক্তৃতাটি প্রস্তুত করতে হয়েছে। সে কারণে এর মধ্যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। আশা করি আলোচকেরা নিজ গুণে তা ক্ষমা করবেন এবং বক্তৃতার মূল বিষয়গুলোর উপর তাঁদের আলোচনা নিবদ্ধ করবেন।

সবশেষে, এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে প্রশ্ন এবং উত্তরের সুযোগ থাকবে। আশা করি সে অংশেও শ্রোতা-দর্শকদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান মতামত জানতে পারবো।

এইটুকু উপক্রমণিকার পর এবার আমার বক্তৃতা পেশ করছি।

ভূমিকা

আমার এই বক্তৃতায় নিম্নরূপ ৫টি প্রশ্ন উত্থাপন করা হবে।

১। বঙ্গবন্ধু বলতে গেলে সবার আগে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন। এই অগ্রগামীতার কারণ কী ছিল? এবং এই অগ্রগামীতার মধ্যে কী কোনো পশ্চাদগামীতাও উপ্ত ছিল?

২। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু যখন ফিরে এলেন তখন কী তিনি পিছিয়ে পড়েছিলেন? এই পিছিয়ে পড়ার মধ্যে কী আবার অগ্রগামীতার বীজ নিহিত ছিল?

৩। বঙ্গবন্ধুর কাছে সমাজতন্ত্রের মডেল কী ছিল? এই মডেল বাস্তবায়নে তিনি কতটুকু সফল হয়েছিলেন, এবং ১৯৭৫ সনের বিয়োগান্তক ঘটনার অনুপস্থিতিতে আরও কতটুকু সাফল্য অর্জন সম্ভব ছিল?

৪। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমাজতন্ত্রের পরবর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু কোন পথে এগোতেন?

৫। বর্তমান পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের প্রেক্ষিতে আগামী দিনের বাংলাদেশ কী হতে পারে? কী হওয়া উচিত এবং কীভাবে তা হতে পারে?

এসব প্রশ্ন উত্থাপনের পাশাপাশি এগুলোর কিছু উত্তরও আমি দেব। তবে এসব উত্তরের চেয়ে প্রশ্নসমূহের দিকেই আমি শ্রোতা/দর্শকদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখায় উৎসাহী, কারণ আমার বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য হলো এসব প্রশ্ন নিয়ে একটি যথাযথ আলোচনার সূত্রপাত করা। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বহু অনুষ্ঠান আয়োজিত হলেও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নাবলীর গভীর এবং সামগ্রিক আলোচনার উদাহরণ কম দেখা যায়। কিন্তু – যে কথাটি আমি আগেও বলেছি -- বংগবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হলো তাঁর কর্মের বিশ্লেষণ এবং তা থেকে আগামী দিনের করণীয় নির্ধারণের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা।

বঙ্গবন্ধুর কর্মের দুটি মূল পর্ব। একটি হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার নেতৃত্ব প্রদানের পর্ব, যার প্রক্রিয়া শুরু হয় কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রাবস্থায় পাকিস্তান আন্দোলনে জোরদার অংশগ্রহণ দ্বারা এবং শেষ হয় ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চের কাল রাত্রে পাকিস্তানী বাহিনী দ্বারা আটক হওয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তিলাভ এবং ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্যাবর্তন থেকে ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট ভোররাতে শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত। অধুনাকালে বঙ্গবন্ধুর উপর আলোচনা তাঁর কর্মের প্রথম পর্ব নিয়েই বেশী সীমাবদ্ধ থাকে, এবং সে তুলনায় দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা কম দেখা যায়। এটা আশ্চর্য্যের নয়। প্রথম পর্বে বংগবন্ধুর ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল, সফল, এবং বলা যেতে পারে অবিতর্কিত। বিপরীতে, দ্বিতীয় পর্বে বঙ্গবন্ধু কতোটা সফল হয়েছিলেন, তা নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে; তদুপরি এই পর্বের বিয়োগান্তক পরিণতি এর আলোচনায় যেতে কুন্ঠাবোধের সৃষ্টি করে। পিতৃহত্যার পাপের কথা কেই-বা স্মরণ করতে চায়! কিন্তু আগামী দিনের বাংলাদেশের জন্য দ্বিতীয় পর্বের বঙ্গবন্ধুর আলোচনাই হয়তো বেশী

প্রাসঙ্গিক। সে কারণে কিছুটা কঠিন হলেও আজকের মূল আলোচনা দ্বিতীয় পর্ব নিয়েই, যদিও এর প্রথম প্রশ্নটি প্রথম পর্ব নিয়ে।

আজকের বক্তৃতার পরিসরে উপরিল্লিখিত সকল প্রশ্নের উৎসারিত আলোচনা সম্ভব নয়। সেজন্য এই আলোচনা কিছুটা থিসিসধর্মী থেকে যাবে। ভবিষ্যতে সময়-সুযোগ হলে এগুলো আরও বিস্তৃত করার চেষ্টা করা যাবে। তবে আশা করি যে, ক্ষুদ্রাকারে আজকের বক্তৃতা একটি বৃহৎ আলোচনার সূত্রপাত করাতে সহায়ক হবে। এবার আমি মূল আলোচনায় যাই। শুরু করি প্রথম প্রশ্ন দিয়ে।

১। বঙ্গবন্ধু বলতে গেলে সবার আগে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন। এই অগ্রগামীতার কারণ কী ছিল? এই অগ্রগামীতার মধ্যে কী কোনো পশ্চাদগামীতাও উপ্ত ছিল?

প্রথম যখন আমি ৬-দফা পড়ি – সেটা ষাটের দশকের শেষ দিকে হবে – আমি বিস্মিত হই। সেখানে দুই প্রদেশের জন্য পৃথক মিলিশিয়া গঠনের দাবী ছিল। সবিশেষ বিস্ময়ের কারণ ছিল ৬ নং দফাটি, যেখানে দুই প্রদেশের জন্য দুই ভিন্ন মুদ্রার দাবী করা হয়।আমার কাছে মনে হয়েছিল, এটা তো স্বাধীনতারই ঘোষণা! এত র‍্যাডিকাল একটি প্রস্তাবনা করা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কী করে সম্ভব হলো?

এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেটা আরও প্রমাণিত হয় ১৯৬১ সনে যখন তিনি – সেসময়ে নিষিদ্ধ -- কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সাথে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। সুবিদিত যে, এ বৈঠকে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেক ছিলেন মণি সিংহ এবং খোকা রায়; আর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং জহুর হোসেন চৌধুরী।[i] এই বৈঠকে বংগবন্ধু বলেন যে, তিনি স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করতে চান। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, এখনই স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করা ঠিক হবে; সেরকম পরিস্থিতি তখনও সৃষ্টি হয়নি; ফলে স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন হঠকারী হবে। অনেক আলোচনার পর বংগবন্ধু নাকি বলেন, “আপনাদের সাথে একমত হলাম না; তবে আপনাদের কথাটি মেনে নিলাম”। স্বাধীনতার দাবীর প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর এই অগ্রগামীতার আরও বহু প্রমাণ আছে, যা উল্লেখের মাধ্যমে এখানে কালক্ষেপণের প্রয়োজন নেই।

কীভাবে স্বাধীনতার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর এই অগ্রগামীতা সম্ভব হয়েছিল, এই প্রশ্নটি আমার মনে বহুদিন ছিল, এবং সম্পূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর পাচ্ছিলাম না। বংগবন্ধু ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের নিবেদিত কর্মী। তিনি জান-প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম করেছেন পাকিস্তানের জন্য। তিনি কী করে সবার আগে পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলার জন্য উদগ্রীব হলেন? এটা কী করে সম্ভব হলো?

অবশেষে এই প্রশ্নের উত্তরটি পাই বঙ্গবন্ধুর “অসমাপ্ত আত্মজীবনী” (রহমান ২০১৪) থেকে। বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের জবানীতেই এই প্রশ্নের সমাধান সূত্রটি দিয়ে গেছেন। ১৯৪৬ সনের নির্বাচনের পর জিন্নাহ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগ থেকে নির্বাচিত সদস্যদের এক কনভেনশন ডাকেন দিল্লিতে, এপ্রিল ৭, ৮, ৯ তারিখে। সুবিদিত, এই নির্বাচনে কেবল বাংলাতেই মুসলিম লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল; কাজেই কনভেনশনে বাংলার প্রতিনিধি দলের যোগদান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদিও বঙ্গবন্ধু একজন

নির্বাচিত সদস্য ছিলেন না, তিনি বাংলার মুসলিম লীগের তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের এক দল নিয়ে সেই কনভেনশনে যোগ দিয়েছিলেন। "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"তে বঙ্গবন্ধু স্পেশাল ট্রেনের দু'টি ইন্টারক্লাস বগিতে "শেখ মুজিবর ও পার্টির জন্য রিজার্ভড" সাইন লাগিয়ে সেই কনভেনশনে যোগদান, দিল্লী দর্শন, এবং ট্রেনে ফেরার এক অসামান্য বিবরণ দিয়েছেন। সেই বিবরণে না যেয়ে আমি শুধু প্রাসঙ্গিক নীচের অংশটুকু উদ্ধৃত করছি।

> "দিল্লি যখন পৌঁছালাম তখন দেখা গেল, যেখানে সকালে আমরা পৌঁছাব সেখানে বিকালে পৌঁছালাম। আট ঘণ্টা দেরি হয়েছে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কনভেনশন বন্ধ করে রেখেছেন আমাদের জন্য। সকাল নটায় শুরু হবার কথা ছিল, আমাদের ট্রেন থেকে সোজা সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হল।দিল্লির লীগ কর্মীরা আমাদের মালপত্রের ভার নিলেন। আমারা বাংলায় স্লোগান দিতে দিতে সভায় উপস্থিত হলাম। সমস্ত সদস্য জায়গা থেকে উঠে সম্বর্ধনা জানাল। জিন্নাহ সাহেব যেখানে বসেছেন, তার কাছেই আমাদের স্থান। যখন উর্দু স্লোগান উঠত, আমরা তখন বাংলা স্লোগান শুরু করতাম।
>
> "জিন্নাহ সাহেব বক্তৃতা করলেন, সমস্ত সভা নীরবে ও শান্তভাবে তাঁর বক্তৃতা শুনল। হনে হচ্ছিল সকলের মনেই একই কথা। পাকিস্তান কায়েম করতে হবে। তাঁর বক্তৃতার পরে সাবজেক্ট কমিটি গঠন হলো। আট তারিখে সাবজেক্ট কমিটির সভা হলো। প্রস্তাব লেখা হল, সেই প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাব থেকে আপাতদৃষ্টিতে ছোট কিন্তু মৌলিক একটা রদবদল করা হল। একমাত্র হাশিম সাহেব আর সামান্য কয়েকজন যেখানে পূর্বে 'স্টেটস' লেখা ছিল সেখানে 'স্টেট' লেখা হয় তার প্রতিবাদ করলেন; তবু তা পাশ হয়ে গেল। ১৯৪০ সালে লাহোরে যে প্রস্তাব কাউন্সিল পাশ করে সে প্রস্তাব আইনসভার সদস্যদের কনভেনশনে পরিবর্তন করতে পারে কিনা এবং সেটা করার অধিকার আছে কিনা, এটা চিন্তাবিদরা ভেবে দেখবে। কাউন্সিলই মুসলিম লীগের সুপ্রিম ক্ষমতার মালিক। পরে আমাদের বলা হল, এটা কনভেনশনের প্রস্তাব, লাহোর প্রস্তাব পরিবর্তন করা হয় নাই। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ঐ প্রস্তাব পেশ করতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অনুরোধ করলেন, কারণ তিনিই বাংলার এবং তখন একমাত্র মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী"।
>
> "জনাব সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতার পরে প্রায় বিশ-পঁচিশজন নেতা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বক্তৃতা করেন এবং প্রস্তাবটা সমর্থন করেন। জনাব আবুল হাশিম সাহেব চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হওয়ার পরে জনাব লিয়াকত আলী খান একটা শপথনামা পেশ করেন এবং সমস্ত প্রদেশের আইনসভার মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যরা এতে দস্তখত করেন"। (রহমান ২০১৪, পৃ. ৫১-৫৪)

এখানে লক্ষ্যণীয়, জিন্নাহ ১৯৪০ সনে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়েছিলেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক দ্বারা, "এস"-সহ, যদিও ফজলুল হক দীর্ঘকাল ছিলেন মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী দল "কৃষক-প্রজা পার্টি"র নেতা এবং কংগ্রেসের সাথে গঠিত কোয়ালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। আবার ১৯৪৬ সনে দিল্লী কনভেনশনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়েছেন বাংলার আরেক নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দ্বারা, এবার "এস" ছাড়া। এসবই জিন্নাহর ক্ষুরধার বুদ্ধি কিংবা চাতুর্য্যের পরিচয় দেয়। কিন্তু জিন্নাহর এই চাতুর্য্যের মধ্যে বঙ্গবন্ধু বিপদেরও আঁচ করেন।

বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর মনে কতখানি দাগ কেটেছিল, তা বোঝা যায় এটা থেকে যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর বইয়ের এই অংশে এই কনভেনশনের প্রস্তাবটি – যা ছিল ইংরাজিতে -- পুরোপুরি উদ্ধৃত করেন (রহমান ২০১৪, পৃ. ৫২-৫৪)। আরও লক্ষ্যণীয়, এর আগে, তাঁর বইয়ের ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু লাহোর প্রস্তাবটিও উদ্ধৃত করেন। সুতরাং, দু'টি বিষয় এখানে লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, "স্টেটস" থেকে "স্টেট" – শুধু একটি বর্ণ "এস" কেটে ফেলা – এটাকে বঙ্গবন্ধু "মৌলিক পরিবর্তন" হিসেবে দেখেছিলেন। দ্বিতীয়ত, এই পরিবর্তন তাঁর মনে প্রশ্নের উদ্রেক করে। তিনি পদ্ধতিগত বা বিধিসম্মতার প্রশ্ন তোলেন প্রশ্ন তোলেন -- দলীয় কাউন্সিলের দলের সংসদ সদস্যদের কনভেনশন পরিবর্তন করতে পারে কিনা। তাঁর মনে একটা উদ্বেগের সঞ্চার ঘটে; বস্তুত তার মন এই পরিবর্তনে সায় দেয় না। ১৯৪৬ সনের ৯ই এপ্রিল দিল্লির সেই পড়ন্ত বিকেলের সভাতেই স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তাটা বংগবন্ধুর কিছুটা-চেতন-আর-কিছুটা-অবচেতন মনে উদিত হয়। বাকীটা ইতিহাস, ইংরাজিতে যাকে বলে, "দি রেস্ট ইজ হিস্ট্রি"!

কিন্তু বঙ্গবন্ধুর চিন্তার এই অগ্রগামীতার মধ্যে আবার পশ্চাদগামীতার প্রশ্ন উঠছে কেন? সেটা উঠছে এ কারণে যে, যদি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নটি হতো শুধুমাত্র ১৯৪০ সনে লাহোরে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাবের "সঠিক" বাস্তবায়ন, তাহলে সেটা কিছুটা দুশ্চিন্তার কারণ হতো বৈকি, কেননা ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন একটি তুলনামূলকভাবে পশ্চাদপদ চিন্তা।[ii] এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের আরবেরা একই ধর্ম এবং একই ভাষার হওয়া সত্ত্বেও এক রাষ্ট্রে সংগঠিত নয়। এটা ঠিক যে, উপমহাদেশের পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে ধর্মের সাথে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বঞ্চনাবোধ কাজ করেছে।[iii] তবে এই বঞ্চনাবোধটি সবচেয়ে বেশী তীব্র ছিল বাংলায়। বাংলার মুসলমানেরা ছিল মূলত হিন্দু জমিদারদের শোষিত প্রজা। কাজেই বংগবন্ধুর যে পাকিস্তান আন্দোলন, তা আপাতদৃষ্টিতে ধর্মীয় জাতীয়তাবোধ তাড়িত হলেও এর অন্তর্নিহিত তাড়নাটি ছিল আর্থ-সামাজিক তথা শ্রেণিগত বঞ্চনা। শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল "দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো"। ফলে, লাহোর প্রস্তাবের সঠিক বাস্তবায়নের দাবীর মধ্যে পশ্চাদগামীতার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল তাড়নার প্রেক্ষিতে সে সম্ভাবনার বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ ছিল কম। অন্তত আশু এবং লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ নেই। কিন্তু দূরবর্তী এবং লক্ষ্যের বাস্তবায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে কী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কোন সীমাবদ্ধতা ছিল? এই সূত্রেই উত্থিত হয় দ্বিতীয় আলোচিতব্য প্রশ্ন।

২। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু যখন ফিরে এলেন তখন কী তিনি পিছিয়ে পড়েছিলেন? এই পিছিয়ে পড়ার মধ্যে কী আবার অগ্রগামীতার বীজ নিহিত ছিল?

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিলএক অর্থে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই। তিনিই জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের দ্বারে পৌঁছে দেন; ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানান; যার য-কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার আহ্বান জানান; মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা কৌশলও তিনি বলে দেন; তিনি হানাদার বাহিনীকে ভাতে ও পানিতে মারার নির্দেশ দেন। বংগবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের এবং সমগ্র জাতিকে উদ্দীপ্ত রেখেছে। ১০ই এপ্রিল যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়, তাতেও বঙ্গবন্ধু ছিলেন রাষ্ট্রপতি।

গেরিলা যুদ্ধের চিন্তাটি যে বঙ্গবন্ধুর মাথায় আগে থেকেই ছিল তার একটি এনেকডোটাল প্রমাণ পাওয়া যায় কথিত নিম্নরূপ ঘটনায়। একসময় একজন সহকর্মী বাংলাদেশের রেললাইনের ম্যাপ দেখিয়ে বংগবন্ধুর দৃষ্টি

আকর্ষণ করে বলেছিলেন যে, আখাউড়া থেকে ফেনী পর্যন্ত রেল লাইনটি ভারতের সীমান্তের কত কাছ দিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু নাকি বলেছিলেন, "চেপে যা! আমরা সীমান্তের ওপার থেকে এসে বোমা মেরে উড়িয়ে দেব!" অর্থাৎ, ভারতকে বেইস হিসাবে ব্যবহার করে বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়টিও তাঁর মাথায় ছিল। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, ষাটের দশকের কোনো এক সময় বঙ্গবন্ধু আগরতলায় গিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন এ মর্মে যে, স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারতের সমর্থন পাওয়া যাবে কিনা। বলা হয়ে থাকে যে, কিছুদিন অপেক্ষা করে ভারতের সরকারের কোন উত্তর না পেয়ে বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরত চলে আসেন। তা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন হতে পারে, এবং সেই যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে – এই চিন্তা বঙ্গবন্ধুর বরাবর ছিল। সেজন্য ভারতের সাথে একটা যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনীতার বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন, এবং চিত্তরঞ্জন সুতারের মাধ্যমে তিনি এ ধরণের একটা যোগাযোগ রক্ষা করতেন বলে যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে।[iv] সুতরাং, বঙ্গবন্ধু শুধু মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণাই ছিলেন না, তিনি মুক্তিযুদ্ধের কলাকৌশল, ভারতের সমর্থন অর্জন, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়েই তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্তি ছিল।

কিন্তু পাশাপাশি এটাও ঠিক যে, বঙ্গবন্ধু শারীরিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের মন্থনের মধ্য দিয়ে না যাওয়ার ফলে বঙ্গবন্ধু যখন ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন কী তিনি মুক্তিযুদ্ধের অগ্রসর চিন্তা-চেতনা যে সীমারেখায় পৌঁচেছিল, সে তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিলেন? যারা তা মনে করেন তারা যেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ।

প্রথমত, কোনো কোনো মহল থেকে সে সময় "জাতীয় সরকার" গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছিল। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটা উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় ঐক্য অর্জিত হয়েছে। এই জাতীয় ঐক্য ধরে রাখা এবং জাতি গঠনের কাজে তা ব্যবহারের জন্য আওয়ামী লীগের দলীয় সরকারের পরিবর্তে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা শ্রেয় হবে। এটা কিছুটা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গঠিত সর্বদলীয় পরামর্শক কমিটির ভাবানুরূপ, যদিও এই প্রস্তাবটি সেই পরামর্শক কমিটির দুই মূল দল – তথা মোজাফফর ন্যাপ এবং সিপিবি – তাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয় নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এ ধরণের চিন্তা গ্রহণ করেন না। তিনি ১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে এগিয়ে যান; এবং পাকিস্তানের ন্যাশনাল এসেম্বলি এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক এসেম্বলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যৌথ সভাকে সাংবিধানিক সভা বলে ঘোষণা দেন এবং তাকে দ্রুত নতুন দেশের সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্বে দেন। ১৯৭২ সনের নভেম্বরে প্রণীত এই সংবিধানের ভিত্তিতে ১৯৭৩ সনের মার্চে তিনি নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন। বলাবাহুল্য, সে নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ বিপুলভাবে জয়লাভ করে, এবং বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগের দলীয় সরকার গঠন করেন।

দ্বিতীয়ত, কোন কোন মহলের মতে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের অব্যবহিত পরের ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ বছরগুলিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের খুঁটিনাটি নিয়ে এবং তা পালন করার জন্য পুনরায় আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে সময় এবং প্রাণশক্তি ব্যয় করাটা যথার্থ ছিল না। তাঁদের মতে, মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ-তিতিক্ষা, বীরত্ব, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জনগণ সমাজের একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। সেকারণে ১৯৭২-১৯৭৩ সময়কালে প্রয়োজন ছিল জনগণের এই বিপ্লবী উদ্দীপনা ব্যবহার করে সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন। সেটা না করার ফলে মুক্তিযুদ্ধ-সৃষ্ট বিপ্লবী উদ্দীপনা বহুলাংশে অপচয়িত হয়। যারা সবচেয়ে তীক্ষ্ণভাবে এ

বিষয়টি অনুধাবন করেন, তাঁদের অন্যতম হলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনিসুর রহমান। এ বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে পরবর্তীকালে একটি বই লিখেন যার শিরোনাম "যে আগুন জ্বলেছিল!" (আনিসুর রহমান ১৯৯৮), অর্থাৎ, আগুনটি জ্বলেছিল, কিন্তু তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় নি; ফলে অবশেষে তা নির্বাপিত হয়ে যায়। অধ্যাপক আনিসুর রহমান তাঁর এম এ ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে জিরাবো নামক গ্রামে যেয়ে ধান চাষ করানোর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেন, বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে কী করা সম্ভব ছিল!

মুক্তিযুদ্ধ-সৃষ্ট বৈপ্লবিক সম্ভাবনার আরেকটি দৃষ্টান্ত ছিল বন্ধবন্ধুর গৃহদাহ, তথা ছাত্রলীগের ভাঙ্গন এবং জাসদের গঠন। ১৯৭২ সনের মাঝামাঝিই ছাত্রলীগ ভেঙ্গে যায়। একটি অংশ "সামাজিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" কায়েমের দাবী তোলে এবং বঙ্গবন্ধুকে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয়ার আহ্বান জানায়। কিন্তু বংগবন্ধু এই আমন্ত্রণে সাড়া দেন না। ১৯৭২ সনের জুলাই মাসে যখন ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ একই তারিখে সম্মেলনের আয়োজন করে এবং বঙ্গবন্ধুকে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানায়, তখন অনেকে ভেবেছিল যে, বঙ্গবন্ধু হয়তো কোনটাতেই যাবেন না; বরং দুই গ্রুপকে একত্র রাখার তথা "বিপ্লবীদের"কেও তাঁর সঙ্গে রাখার জন্য আরও চেষ্টা করবেন, অন্তত সময় নিবেন। কিন্তু যখন বংগবন্ধু মুজিববাদী ছাত্রলীগের সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিলেন তখন এই "বিপ্লবী"দের সাথে তাঁর ছেদটি চূড়ান্ত হয়ে যায়। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই অক্টোবরে এই "বিপ্লবী"রা "জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)" নামক রাজনৈতিক দল গঠন করে, এবং বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উচ্ছেদের ভ্রাতৃঘাতি সংগ্রামে নিয়োজিত হয়।

ছাত্রলীগের ভাঙ্গন এবং জাসদ গঠনের পেছনে কোন ষড়যন্ত্র ছিল কিনা, সে বিষয়ে অনেক ধরণের কথা চালু আছে; এবং জাসদ নিয়ে বহু বই লিখলেও মহিউদ্দিন আহমদও সে বিষয়টি খোলাসা করতে পারেন নাই অথবা করেন নাই (যেমন, আহমদ ২০১৪)। জাসদ নিয়ে ১৯৮০ সনে আমি যে বই লিখেছিলাম, তাতে আমি সে ষড়যন্ত্রের তালাশে যাই নি, কেননা "আন্ডার-দি-টেবিল" কিছু ঘটেছিল কিনা, তার উদঘাটন আমার উদ্দেশ্য ছিল না (ইসলাম ১৯৮১)। আমার উদ্দেশ্য ছিল "ওভার-দি-টেবিল" জাসদের যেসব দলিল ও প্রকাশনা তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাসদের তত্ত্ব এবং রাজনীতির অসারতা প্রমাণ করা[৮]। তবে তত্ত্বের অসারতা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ছাত্রলীগের অপেক্ষাকৃত চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর, আন্তরিক, এবং বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন অংশকে জাসদ আকর্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের এই বিপথগামী হওয়াটাও মুক্তিযুদ্ধ-সৃষ্ট বৈপ্লবিক সম্ভাবনার অপচয়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত ছিল।

আরেকটি উদাহরণ দিয়েই এ বিষয়টির ইতি টানবো। সেটা হলো মুক্তিযোদ্ধাদের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত। অনেকের প্রস্তাব ছিল: দেশ গঠনে মুক্তিযোদ্ধাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা প্রদান। এই প্রস্তাবের আবার দু'টি দিক ছিল। একটি হলো সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত আর অন্যটি হলো বেসামরিক প্রশাসন সংক্রান্ত। প্রথমোক্ত বিষয়ে একটি প্রস্তাব ছিল যে, সনাতনী পেশাদার, শ্রেণী-বিভক্ত সামরিক বাহিনীতে ফিরে না যেয়ে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে ধরণের জনসম্পৃক্ত বাহিনী গড়ে উঠেছিল, তাকেই আরও বিকশিত করে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা উপযুক্ত এবং ইচ্ছুক তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে এই বাহিনী গঠন করা প্রয়োজন – যে বাহিনী জন-বিচ্ছিন্ন এবং ক্যান্টনমেন্টে আবদ্ধ না থেকে দেশের উৎপাদন কর্মকান্ডে জনগণের সাথে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করবে, যেমনিভাবে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। একইভাবে বেসামরিক প্রশাসনের ক্ষেত্রেও

প্রস্তাব ছিল পুরাতন ঔপনিবেশিক ধারার প্রশাসন যন্ত্রে ফেরত না যেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে উপযোগী বাছাই এবং প্রশিক্ষণের মধ্যমে নতুন প্রশাসন যন্ত্র গড়ে তোলার।

বঙ্গবন্ধু এসব প্রস্তাবেও বিশেষ উৎসাহী হন না। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার ব্যবস্থা করেন; আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন; প্রশাসনে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোটার ব্যবস্থা করেন; এবং অন্যান্য অনেকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের তাদের বীরত্ব এবং ত্যাগের স্বীকৃতি প্রদান করেন। তবে সাধারণভাবে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের "যার যার কাজে ফেরত যাওয়া"র আহ্বান জানান।

অনেকের মতে এসব পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এর অগ্রসর চিন্তা-ভাবনা যে সীমারেখায় পৌঁছেছিল, সে তুলনায় বঙ্গবন্ধু পিছিয়ে পড়েছিলেন। এবং আরও দাবী করা হয় যে, বঙ্গবন্ধু নিজেই দ্রুত বুঝতে পারেন যে, তিনি পিছিয়ে পড়েছেন এবং তা কাটিয়ে ওঠার জন্য তিনি ১৯৭৫ সনের জানুয়ারিতে "দ্বিতীয় বিপ্লব"এর ঘোষণা দেন। লক্ষ্যণীয় যে, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে উপরে যেসব অগ্রসর চিন্তাভাবনা উল্লিখিত হলো তার অনেকগুলোর প্রতিফলনও দেখা যায়। যেমন, ১৯৭২-১৯৭৩ সময়কালে বহু সময় এবং পরিশ্রম দিয়ে যে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন, তা বাতিল করে এক দলীয় ব্যবস্থা চালু করলেন। তিনি আওয়ামী লীগের পরিবর্তে "বাকশাল" গঠন করেন এবং সে অনুযায়ী সরকার পুনর্গঠন করেন। এক অর্থে এটা ছিল ১৯৭২ সনে প্রস্তাবিত জাতীয় সরকার গঠনের প্রয়াসের মতোই।প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত গর্ভনর প্রথা কিছুটা হলেও ঔপনিবেশিক ধাঁচ থেকে বেড়িয়ে আসার প্রচেষ্টার মতো ছিল। আর প্রতি গ্রামে বাধ্যতামূলক সমবায় গঠনের যে কর্মসূচি তিনি ঘোষণা করেন, তা ছিল একটি সামাজিক বিপ্লবের কর্মসূচি। সুতিরাং, বলা যেতে পারে যে, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তিন বছর পর বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক উদ্যোগী ভূমিকা ফিরে পান।

কিন্তু আপাতদৃষ্টির এই পিছিয়ে পড়ার মধ্যেও কী কোন অগ্রগামীতার উপাদান ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা দরকার যে, মুক্তিযুদ্ধ-সৃষ্ট বিপ্লবী সম্ভাবনার হৃদয়ঙ্গমে ঘাটতি থাকলেও বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সনে যে সংবিধান প্রণয়ন করে দিয়ে গেছেন, বাংলাদেশের জন্য আজও তা একটি মূল্যবান পাথেয়। প্রথমত, মাত্র নয় মাসের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করাটাই ছিল এক বিশাল অর্জন। লক্ষ্যণীয়, ভারতের সংবিধান প্রণয়নে সময় লেগেছিল প্রায় আড়াই বছর; আর পাকিস্তানের প্রায় আট বছর। বস্তুত, যতদিনে -- ১৯৫৬ সনের মার্চ মাসে – পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত হয়, ততোদিনে পাকিস্তান ইতিমধ্যে সামরিক শাসনের দোরপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের এই করুণ অভিজ্ঞতা – যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজে গিয়েছিলেন – ছিল একটি কারণ, কেন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরেই সংবিধান প্রণয়নের কাজের প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেন।

১৯৭২ সনের এই সংবিধান অনেক যত্নের সাথে প্রণীত হয়েছিল এবং অনেক প্রাগসর চিন্তা-ভাবনা তাতে অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিফলিত হয়েছিল। বড় কথা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, এবং সমাজতন্ত্র বাংলাদেশের চারটি রাষ্ট্রীয় মূল নীতি হিসেবে সাংবিধানিকভাবে প্রোথিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে দুই সামরিক শাসকের আমলে এই সংবিধানের উপর যার-পর-নাই বলাৎকার সাধিত হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে সেগুলোর বহুলাংশে প্রতিকার করা গেছে, যদিও এখনও সংবিধান তার ১৯৭২ সনের মূল রূপ পুরোপুরি ফিরে

পায় নি। তা সত্ত্বেও ১৯৭২ এর সংবিধান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষাকে বহুলাংশে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যার ফলে এখনও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে ১৯৭২ সনের সংবিধানে প্রত্যাবর্তনের দাবী জানাতে হয়।বঙ্গবন্ধুর পিছিয়ে পরার মধ্যেও যে অগ্রগামীতার বীজ নিহিত ছিল এটা তারই একটি উদাহরণ। তবে এই বড় উদাহরণের পাশাপাশি আর বহু উদাহরণ রয়েছে। যে আইনের মাধ্যমে অবশেষে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার (অন্তত আংশিকভাবে হলেও) সম্পন্ন হয়েছে, সেটাও বংগবন্ধুর প্রণীত আইন। কী অভ্যন্তরীণ, কী আন্তর্জাতিক – উভয় ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু বহু প্রগতিশীল প্রক্রিয়ার সূচনা করে দিয়ে গেছেন, যার সুফল থেকে আজও বাংলাদেশ উপকৃত হচ্ছে।

৩। বঙ্গবন্ধুর কাছে সমাজতন্ত্রের মডেল কী ছিল? এই মডেল বাস্তবায়নে তিনি কতোটুকু সফল হয়েছিলেন, এবং ১৯৭৫ সনের বিয়োগান্তক ঘটনার অনুপস্থিতিতে আরও কতোটুকু সাফল্য অর্জন সম্ভব ছিল?

আজ আর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বঙ্গবন্ধু নিজে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। বহুকাল যাবত একটা প্রচার ছিল যে, স্বাধীনতার পর সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য জাতীয়করণ ইত্যাদি যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল, সেগুলো ছিল বহুলাংশে বঙ্গবন্ধুর উপর অন্যদের দ্বারা চাপিয়ে দেয়া অথবা নেহাত অবস্থার চাপে গৃহীত কর্মসূচি, এবং এসবে বঙ্গবন্ধুর নিজের বিশেষ সায় ছিল না। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* এবং *আমার দেখা নয়াচীন* বইসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পর পরিষ্কার যে, এসব প্রচারের কোন সত্যতা নেই। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে বংগবন্ধু পরিষ্কার লিখেছেন

> আমি কমিউনিস্ট নই; কিন্তু সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে, ততদিন মানুষের উপর মানুষের শোষণ বন্ধ হতে পারে না। (রহমান ২০১৪, পৃ ২৩৪)

১৯৫২ সনের অক্টোবরে চীনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে বঙ্গবন্ধু চীন সফর করেন; এবং বিপ্লব-পরবর্তী চীনের অগ্রগতি দেখে অভিভূত হন। চীনের বিপ্লবের চেয়ে দুই বছর আগে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তানের সাথে তুলনা স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে, এবং সে তুলনার ফলে চীনের সাফল্য তাঁর মনে আরও বেশী দাগ কাটে। তার মানে এই নয় যে, বঙ্গবন্ধু একজন "আলমারিতে লুকানো" (ইংরাজিতে "ক্লজেট") কমিউনিস্ট হয়ে যান। তিরিশের দশকে রাশিয়া সফরে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন রাশিয়ার বিভিন্ন সাফল্য দ্বারা চমৎকৃত হওয়ার পরও সে দেশের সমাজ ব্যবস্থার কিছু দিক নিয়ে সন্দিহান হন; তেমনি বঙ্গবন্ধুও চীনের বিভিন্নমুখী সাফল্য সত্ত্বেও কতক বিষয়ে মনে প্রশ্ন নিয়েই দেশে ফিরেন।

বংগবন্ধুর জন্য প্রশ্নের মূল জায়গাটা ছিল গণতন্ত্র নিয়ে। সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী হিসেবে বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি বংগবন্ধু আকর্ষিত ছিলেন।এই বিষয়ে চীন অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের (তথা বিদ্যমান) সমাজতন্ত্রের সাথে বঙ্গবন্ধুর একটা বিরোধ থেকে যায়। সে কারণেই তিনি সমাজতন্ত্রের সাথে গণতন্ত্রের সংশ্লেষণের প্রস্তাবনায় উৎসাহী হন। তারই সূত্র ধরে ১৯৭২ সনে সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র – উভয়ই বাংলাদেশের সংবিধানে মূল রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। একই কারণে যখন স্বাধীনতার পর অনেকে

যখন প্রচার শুরু করেন যে, সমাজতন্ত্রের সাথে গণতন্ত্রের সংশ্লেষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু একটি নতুন মতবাদের (তথা মুজিববাদ) প্রবর্তন করেছেন, তখন তিনি তা নাকচ করে না বরং আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্রয়ই দেন।

বলা দরকার যে, প্রথমত, সমাজতন্ত্রের প্রতি এই অনুরাগ শুধু বঙ্গবন্ধুর একার নয়; তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুলসহ আওয়ামী লীগের অন্য অনেক নেতার জন্যও তা প্রযোজ্য ছিল। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রের বিষয়টি আওয়ামী লীগের এসব নেতাদের জন্য হঠাৎ করে ১৯৬৯ সনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফার কারণে কিংবা ১৯৭০ সনের নির্বাচনে জেতার প্রয়োজন দ্বারা সৃষ্ট অনুরাগ ছিল না। বলা যেতে পারে, ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার থেকেই সমাজতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অভিমুখী আর্থ-সামাজিক দাবিদাওয়া ও কর্মসূচি সামনে চলে আসে। অজকের অন্যতম আলোচক ডঃ বিনায়ক সেন "সমকাল" পত্রিকার "কালের খেয়া" নামক সাপ্তাহিক সাহিত্য অংশে "বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র – বাহাত্তরের সংবিধান ও সমতামুখী সমাজের আকাঙ্ক্ষা" শীর্ষক তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর নিজের ও তাঁর ঘনিষ্ট সহকর্মীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণের ইতিহাস এবং আওয়ামী লীগের কর্মসূচি এবং নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ক্রমান্বয়ে তার প্রতিফলনের অনুপংখ বিবরণ এবং বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন এবং করছেন (সেন ২০২০-২০২১)। এই ইতিহাস সম্পর্কে উৎসাহীরা বিনায়ক সেনের এই রচনা থেকে বিস্তারিত তথ্য পেতে পারেন।

প্রশ্ন হলো, বঙ্গবন্ধুর কাছে সমাজতন্ত্রের মডেলটি কী ছিল? এ প্রসঙ্গে ১৯৭৫ সনের জুলাই মাসে নবগঠিত বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে দেয়া বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু লক্ষ্যণীয়।

> "তবে এখানে যে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা আমরা বলেছি, সে অর্থনীতি আমাদের, সে ব্যবস্থা আমাদের। কোন জায়গা থেকে হায়ার (ভাড়া) করে এনে, ইমপোর্ট (আমদানি) করে এনে কোন ইজম (মতবাদ) চলে না। এ দেশে – কোনো দেশে – চলে না। আমার মাটির সাথে, আমার মানুষের সাথে, আমার কালচারের (সংস্কৃতির) সাথে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের (পটভূমির) সাথে, আমার ইতিহাসের সাথে যুক্ত করেই আমার ইকনমিক সিস্টেম (অর্থনৈতিক ব্যবস্থা) গড়তে হবে। কারণ আমাদের দেশে অনেক সুবিধা আছে। কারণ, আমার মাটি কী, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কী, তা না জানলে হয় না। ফান্ডামেন্টালি (মূলগতভাবে) আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই। আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে চাই। বাট দি সিস্টেম ইজ আওয়ার্স। উই ডু নট লাইক টু ইমপোর্ট ইট ফ্রম এনিহোয়ার ইন দি ওয়ার্ল্ড (তবে ব্যবস্থাটি আমাদের। পৃথিবীর অন্য কোথাও থেকে এটা আমদানি করার ইচ্ছা আমাদের নেই। (ইসলাম ২০১৭, পৃ ১৭)"

নিজস্ব ধরণের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই অভিপ্রায়ের পেছনে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক মডেল – তথা একদলীয় শাসনের মডেল -- নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সংশয়ের বিষয়টি উপরে ইতিমধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে। বিপরীতে তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র বজায় রেখেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।[vi] কিন্তু সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক মডেল সম্পর্কে তিনি বহুলাংশে তখনকার প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রকেই গণ্য মনে করেছিলেন। সে কারণেই তিনি স্বাধীনতার পরই শিল্প, ব্যাংক, বীমা, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক জাতীয়করণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আমরা জানি যে, বঙ্গবন্ধুর এই জাতীয়করণ কেবল পাকিস্তানী মালিকদের পরিত্যাক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গালী মালিকানাধীন বৃহৎ কলকারখানা, ব্যাংক এবং বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহও তাতে অন্তর্ভুক্ত

হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ১৯৭২ সনের ২৬শে মার্চ উপর্যুক্ত জাতীয়করণ ঘোষণা দিয়ে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন, তার নিম্নের অংশটুকু প্রণিধানযোগ্য।

> "আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। অবাস্তব তাত্ত্বিকতা নয়। আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে হবে। শোষণ ও অবিচারমুক্ত নতুন সমাজ আমরা গড়ে তুলবো। জাতির এই মহাক্রান্তিলগ্নে সম্পদের সামাজিকীকরণের পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচির শুভ সূচনা হিসেবে আমার সরকার উল্লিখিত বিষয়গুলো জাতীয়করণ করেছে। (ইসলাম ২০১৭, পৃ ১২)"

এই উদ্ধৃতিতে "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" এবং "সম্পদের সামাজিকীকরণ" শব্দ-বন্ধ সমূহের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। আওয়ামী লীগের দলিল-পত্রাদিতে সমাজতন্ত্র বিষয়ক পূর্বেকার আলোচনায় এসব শব্দ-বন্ধের তেমন ব্যবহার দেখা যায়নি। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় এসব শব্দ-বন্ধের অন্তর্ভুক্তির মধ্যে বরং সিরাজুল আলম খানের প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে (পেয়ারা ২০১৯)। যাহোক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, শিল্প এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের মডেলেরই অনুসারী ছিল। এই মডেলটি অনুসরণ করা সম্ভব হয়েছিল আরও এ কারণে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের তেইশ পরিবারের শিল্প-ব্যাঙ্ক-বীমা-বাণিজ্যের উপর মালিকানার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে এক হয়ে গিয়েছিল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য আর সামাজিক মুক্তির আন্দোলনের লক্ষ্য এখানে অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

তবে কৃষির ক্ষেত্রে বিষয়টা এত সহজ ছিল না। কৃষির ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত মডেলটি ছিল যৌথ খামার। কৃষি বিষয়ক বঙ্গবন্ধুর নীতির বিবর্তন সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে একাধিক বইতে আলোচনা করেছি। ১৯৮৭ সনে প্রকাশিত *বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল* (ইসলাম ১৯৮৭) শীর্ষক বইতে তার একটি বিস্তারিত উপস্থাপনা ছিল।[vii] পরিবর্তিতে ২০১১ সনে প্রকাশিত *বাংলাদেশের গ্রাম – অতীত এবং ভবিষ্যৎ* (ইসলাম ২০১১) বইতে এবং ২০১২ সনে প্রকাশিত *আগামী দিনের বাংলাদেশ* (ইসলাম ২০১২) বইতে সে আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে পুনরায় পরিবেশিত হয়েছিল। সবশেষে, ২০১৭ সনে প্রকাশিত *বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এবং বাংলাদেশের গ্রাম* (ইসলাম ২০১৭) বইতে সে আলোচনার পুনরুল্লেখ করে বর্তমানের করণীয়র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে উৎসাহী পাঠকেরা এসব বইতে কৃষি বিষয়ক বঙ্গবন্ধুর নীতির বিবর্তনের ইতিহাস এবং তার কার্য-কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন। সুতরাং, এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

সংক্ষেপে আমরা জানি যে, বঙ্গবন্ধু শুরু করেন ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং ১০০-বিঘা পর্যন্ত জমি মালিকানার সিলিং আরোপের প্রয়াস দিয়ে। প্রথমটি সহজে করা গেলেও দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তিনি নিজ দলের ভেতর থেকেই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। ফলে পরিবারের সংজ্ঞার শিথিল করার মাধ্যমে ১০০ বিঘা সিলিং সংক্রান্ত নীতিটি বহুলাংশে অকার্যকর হয়ে যায়। অবশেষে, ১৯৭৫ সনে দ্বিতীয় বিপ্লবের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু যৌথ চাষ সম্বলিত প্রতি গ্রামে বাধ্যতামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

সুতরাং আমরা দেখি যে, ১৯৭৫ সনের দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু যেখানে এসে পৌঁছান তা বহুলাংশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মডেলেরই অনুযোগী ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাতে ছিল একদলীয় শাসন; কৃষি ক্ষেত্রে তাতে ছিল যৌথ চাষ সম্বলিত সমবায়; আর শিল্প ও বাণিজ্যে ছিল জাতীয়করণ, যা ১৯৭২ সনেই সূচিত হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সমাজতন্ত্রের এই মডেল বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু কতটা সফল হয়েছিলেন?

এক্ষেত্রে জাতীয়করণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা কিছুটা জানি। মোটা দাগে বলা যায়, এই অভিজ্ঞতা খুব একটা উৎসাহব্যাঞ্জক ছিল না। নীতি এবং বাস্তবায়ন – উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা ছিল। নীতির বিষয়ে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, জাতীয়করণকৃত বাঙ্গালী মালিকানার প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক হিসেবে প্রাক্তন মালিকদের নিয়োগ দেয়া প্রথম থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। অন্যান্য জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু বিদ্যমান প্রশাসনকে ব্যবহার করেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সে উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বহু কর্পোরেশন গঠিত হয়। কিন্তু প্রাক্তণ মালিকেরা যেমন, তেমনি নবনিযুক্ত আমলারাও সততা এবং দক্ষতার সাথে জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনায় বহুলাংশে অপারগ হন। ফলে উন্নয়ন বাজেটের জন্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টির পরিবর্তে এসব প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ লোকসানি সংস্থায় পরিণত হয়।

রেহমান সোবহান এবং মুজাফফর আহমেদ *Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study in the Political Economy of Bangladesh* শীর্ষক বৃহৎ গ্রন্থে উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন (Sobhan and Ahmed 1980)। অধ্যাপক নূরুল ইসলামও তাঁর একাধিক বইতে এই প্রক্রিয়ার আলোচনা করেছেন (যেমন, Nurul Islam 1979 and 2017)। এসব গবেষকদের আলোচনায় যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো, জাতীয়করণ বাস্তবায়নের মতো রাজনৈতিক দল বঙ্গবন্ধুর ছিল না। রেহমান সোবহান এবং মুজাফফর আহমদের বইয়ের শিরোনাম থেকেই পরিষ্কার যে, তাঁরা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে একটি "মধ্যবর্তী" চরিত্রের সরকার বলে আখ্যায়িত করেছেন, অর্থাৎ, এমন একটি সরকার যা পুরোপুরি ধনিক শ্রেণির নয়; আবার তা পুরোপুরি শ্রমিক শ্রেণীরও নয়। এ ধরণের একটি সরকারের পক্ষে জাতীয়করণ সফল করা সম্ভব ছিল না কিংবা কঠিন ছিল। অধ্যাপক নূরুল ইসলামও মোটামুটি একই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাপক আনিসুর রহমানের এ বিষয়ে পরিলক্ষণ ছিল আরও পূর্বগামী। ১৯৭৩ সনে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হলে এই পরিকল্পনা প্রণেতাদের আগ্রহে এবং মূলত এই পরিকল্পনা আলোচনার জন্য ১৯৭৪ সনে ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক এসোসিয়েশন (আই-ই-এ) ১৯৭৪ সনে ঢাকায় *The Economic Development of Bangladesh within a Socialist Framework* শিরোনামে এক সম্মেলনের আয়োজন করে। সে সম্মেলনে "Priorities and Methods for Socialist Development of Bangladesh," শীর্ষক প্রবন্ধে আনিসুর রহমান বাংলাদেশের তখনকার বহুদলীয় গণতন্ত্রের রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে সমাজতন্ত্র নির্মাণের লক্ষ্যের মধ্যে একটা অসংগতি লক্ষ্য করেন, এবং বলেন যে, কিভাবে এই অসংগতি নিরসিত হয়, আগামীতে সেটাই হবে পর্যবেক্ষণের বিষয় (Rahman 1974)। এক অর্থে ১৯৭৫ সনের বাকশাল গঠন এবং এক দলীয় শাসনের প্রবর্তনের মাধ্যমে এই অসংগতির নিরসন ঘটে; কিন্তু নেতৃত্ব প্রদানকারী রাজনৈতিক শক্তির "মধ্যবর্তী" চরিত্রের যে সমস্যা নূরুল ইসলাম, রেহমান সোবহান, এবং অন্যরা

চিহ্নিত করেছিলেন, তা বাকশাল গঠনের দ্বারা দূর হয় না। ফলে, জাতীয়করণ সফল করার সমস্যা থেকেই যায়। তদুপরি, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সফল পরিচালনার সমস্যা শুধুমাত্র "মধ্যবর্তী" শ্রেণী চরিত্রের রাজনৈতিক শক্তিরই নয়; এমনকি পুরোদস্তুর কমিউনিস্ট পার্টি শাসিত সরকারের জন্যও প্রযোজ্য। অর্থাৎ, সমস্যা আরও গভীরের।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে, কৃষির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু যে সীমিত চরিত্রের জমির পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা সফল হয় না। বস্তুত এই অসাফল্যই বংগবন্ধুর যৌথচাষ ভিত্তিক সমবায়ের কর্মসূচির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পেছনে একটি কারণ হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু ১৯৭৫ আগস্টের বিয়োগান্তক পরিণতির কারণে বঙ্গবন্ধু সে কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুযোগ পান নি। কিন্তু এক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্রের পরবর্তী আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা নিম্ন উৎপাদিকা শক্তির স্তরে যৌথচাষ সফল করার বিষয়ে গভীর সমস্যার ইংগিত দেয়। যে নয়াচীন দেখে বঙ্গবন্ধু এত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সেই নয়াচীন মাত্র তিন বছর পরই ১৯৭৮ সনে যৌথচাষ পরিত্যাগ করে পরিবার-ভিত্তিক কৃষিতে ফেরত যায়। দ্রুতই এশিয়ার আরেক কমিউনিস্ট পার্টি শাসিত দেশ, ভিয়েতনাম, চীনের পথ অনুসরণ করে। সুতরাং, যৌথচাষ ভিত্তিক সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি বাস্তবায়নেও বঙ্গবন্ধু যে কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতেন, তা মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

রাজনৈতিক কাঠামো সংক্রান্ত যে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, তথা একদলীয় শাসন, সেটা সম্পর্কে বলা দরকার যে, বঙ্গবন্ধু নিজেও এটাকে একটা পরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই কর্মসূচির অন্যতম যুক্তি ছিল যে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিত প্রয়োজন। সুতরাং, মূল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড -- তথা জাতীয়করণ এবং যৌথচাষ ভিত্তিক কৃষি সফল করা – এসব ক্ষেত্রে যদি পূর্বেকার চ্যালেঞ্জ অব্যাহত থাকতো এবং নতুন চ্যালেঞ্জের উদ্ভব ঘটতো, তাহলে একদলীয় শাসনের বিষয়টিও সময়ে প্রশ্নবিদ্ধ হতো বলে অনুমান করা যায়।সব মিলিয়ে এ কথা বলা সম্ভবত অসংগত হবে না যে, ১৫ই আগস্টের বিয়োগান্তক ঘটনা যদি নাও ঘটতো, এবং বংগবন্ধু জীবিত থাকতেন এবং তাঁর সরকার অব্যাহত থাকতো, তাহলেও সমাজতন্ত্রের যে মডেল নিয়ে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন, তা যথেষ্টই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতো। এমতাবস্থায় বঙ্গবন্ধু কী করতেন? সেটাই হচ্ছে পরবর্তী প্রশ্ন।

৪। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমাজতন্ত্রের পরবর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু কোন পথে এগোতেন?

বংগবন্ধুর বিভিন্ন অসাধারণ গুণের মধ্যে রয়েছে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব; পরিস্থিতির পরিবর্তন দ্রুত বুঝতে পারার মতো পর্যবেক্ষণ শক্তি; এবং সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারার ক্ষমতা। উপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম, কীভাবে বঙ্গবন্ধু প্রয়োজনবোধে বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র – যে গণতন্ত্রের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন – বাতিল করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে গেলেন; কীভাবে সীমিত পরিধির পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারে বাঞ্ছিত সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও তার চেয়েও অগ্রসর চরিত্রের গ্রামীণ জীবনের রূপান্তরের কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। এগুলোর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু বিস্ময়কর নমনীয়তার পরিচয় দেন। সুতরাং, এটা অতিশয়োক্তি হবে না যে, চীনে ১৯৭৮ সনে সূচিত – বস্তুত, এই প্রক্রিয়া নীচ থেকে, স্বতস্ফূর্তভাবে ১৯৭৬ সন থেকেই শুরু হয় – যৌথচাষ থেকে পারিবারিক চাষে প্রত্যাবর্তন বঙ্গবন্ধুকে গভীরভাবে আলোড়িত করতো

এবং তিনি এই প্রত্যাবর্তনের আলোকে তাঁর সদ্য ঘোষিত কৃষি বিষয়ক কর্মসূচির পুনর্নিরীক্ষণে ব্যাপৃত হতেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

১৯৮৪ সন থেকে – বস্তুত পরীক্ষামূলকভাবে সিচুয়ান প্রদেশে ১৯৮২ সন থেকে – চীন তার রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বাজার-নির্ভর পরিচালন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সূচনা করে। নিঃসন্দেহে এই পরিবর্তনও বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি এড়াতো না, এবং তিনি বাংলাদেশের জন্য এই পরিবর্তনের তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করতেন এবং তা থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের সফল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় আহরণের চেষ্টা করতেন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর আরেকটি যে বিশেষ গুণের উল্লেখ করতে হয় তা হলো, বিদ্বান এবং জ্ঞানী-গুণী মানুষের কদর করা। তিনি নিশ্চয়ই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালন ব্যবস্থায় চীন কর্তৃক প্রবর্তিত পরিবর্তনসমূহ বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিতেন; তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন; এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এটা ঠিক যে, চীনের পরিস্থিতি আর বাংলাদেশের পরিস্থিতি এক নয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সরকারের পক্ষে যা করা সম্ভব তা বাকশাল গঠনের পরও বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে করা সম্ভব হতো কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের আরও দক্ষ পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু যে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হতেন, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

আরও পরে, ১৯৮৯ সনে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক সরকারসমূহের পতন এবং ১৯৯১ সনে খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনে বঙ্গবন্ধু যে গভীরভাবে ব্যথিত হতেন সে ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এবং পাকিস্তানের কারাগারে তাঁর নিজের সুরক্ষা এবং কারাগার থেকে মুক্তির বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা বঙ্গবন্ধু ভুলতেন না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ও সহযোগিতা চুক্তি বঙ্গবন্ধুই সাক্ষর করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের হাসপাতালে তিনি নিজের চিকিৎসার জন্য অস্ত্রোপচারও করিয়েছিলেন, এবং বিলাতের অস্ত্রোপচারের চেয়ে সেটি যে বেশী ভাল হয়েছিল, তাও তিনি লোকজনকে বলতেন। বাংলাদেশের এই অকৃত্রিম বন্ধুদেশের বিপর্যয়ে বঙ্গবন্ধু নিশ্চয়ই মর্মাহত হতেন।

একই সাথে বঙ্গবন্ধু এই বিপর্যয়ের কারণ উপলব্ধিতে সচেষ্ট হতেন। তাঁর ছিল বিস্ময়কর সজ্ঞা (ইনট্যুশান)। এই সজ্ঞার দ্বারা তিনি সমস্যার গভীরে চলে যেতে পারতেন। তিনি বুঝতে পারতেন যে, নিরঙ্কুশ পরিকল্পনার (টোটাল প্ল্যানিং)-এর ঘেরাটোপে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহের অর্থনীতির প্রাণশক্তি স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল। পাশাপাশি এসব দেশের অভ্যন্তরে সরকারসমূহের জনসম্পৃক্তি হ্রাস এক বাড়তি বিপদের সৃষ্টি করে। আর তার সাথে বাইরের পুঁজিবাদী দেশসমূহের চাপতো ছিলই।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের সরকার এবং সমাজ ব্যবস্থাসমূহের পতনের কারণে কী বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতেন? আমার তা মনে হয় না। বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস এরকম পদ্মপাতায় জলের মতো ছিল বলে আমি মনে করি না। সমাজতন্ত্রে বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস এর কোনো সুনির্দিষ্ট মডেলের উপর ভিত্তি করে ছিল না। তাঁর মূল চালিকা শক্তি ছিল "দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো"র বাসনা। তিনি মনে করতেন পুঁজিবাদ একটি শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, আরও অগ্রসর হয়ে তিনি পুঁজিবাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহকে সম্পর্কিত করেন। "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"তে তিনি লিখেন:

> “পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জনগণের কর্তব্য বিশ্বশান্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা। যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে যারা আবদ্ধ ছিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাদের সর্বস্ব লুট করেছে – তাদের প্রয়োজন নিজের দেশকে গড়া ও জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির দিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। (রহমান ২০১৪, পৃ. ২৩৪)”

উপরের উদ্ধৃতিতে ব্যক্ত পুঁজিবাদের মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহ পূর্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণে বাতিল হয়ে যায় না। ফলে, বংগবন্ধুর জন্য সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাটা থেকেই যেত। তিনি বুঝে নিতেন যে, সমাজতন্ত্রের একটি মডেল – যা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ অনুসরণ করা হয়েছিল – শেষ পর্যন্ত টিকতে পারে নাই। কিন্তু সমাজতন্ত্রের অন্য মডেলের অন্বেষা তাতে বাতিল হয়ে যায় নি (ইসলাম ২০১৫, ২০১৯)। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি হয়তো আশ্বস্ত হতেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো চীনও ধ্বসে পড়ে নি, বরং বাজার ব্যবস্থা এবং ব্যক্তি মালিকানা এবং উদ্যোগের সুযোগ বৃদ্ধি করে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হয়েছে, এবং দ্রুত অর্থনৈতিক এবং কারিগরী-প্রযুক্তিগত অগ্রগতি লাভ করছে। ১৯৫২ সনের চীন দেখে বঙ্গবন্ধু যতটা চমৎকৃত হয়েছিলেন, অধুনাকালের চীন দেখলে তিনি নিশ্চয়ই আরও বেশী চমৎকৃত হতেন।

সংক্ষেপে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমাজতন্ত্রের সাম্প্রতিককালের উত্থান-পতনে বঙ্গবন্ধু পথ হারাতেন না। “দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো”র যে ব্রত নিয়ে বঙ্গবন্ধু কৈশোর থেকে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং জীবন-যৌবন উৎসর্গ করে নিবেদিত থাকেন, সে ব্রত তাঁকে হাল ছেড়ে স্রোতে গা ভাসাতে দিত না। তিনি বুঝতে চাইতেন কোন কারণে কী সমস্যা হচ্ছে এবং কীভাবে সে সমস্যার নিরসন করা যায়। নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার বিশ্বব্যাপী যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তাতে তিনিও শামিল হতেন। বাংলাদেশের নিজস্ব পরিস্থিতির আলোকে তিনি তাঁর সমাজতন্ত্রের মডেল পরিমার্জিত করে নিতেন। তাঁর এই মনোভাবটি তিনি ১৯৭৩ সনেই ব্যক্ত করেছিলেন নিম্নরূপ:

> “সমাজতন্ত্র আমাদের প্রয়োজন। সমাজতন্ত্র না হলে এ দেশের দুঃখী মানুষের বাঁচবার উপায় নাই। আমরা শোষণহীন সমাজতন্ত্র চাই”। ... তবে “সমাজতন্ত্রের রাস্তা সোজা নয়। সমাজতন্ত্র করতে হলে যে ক্যাডারের দরকার, তা আমরা করতে পেরেছি কিনা, এ নিয়ে আলোচনার দরকার আছে”। কিন্তু তিনি ঘোষণা করেন যে, “সমাজতন্ত্রের রাস্তায় আমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছি , তা থেকে আমরা পিছু হটতে পারি না, পারবো না – যত বড় ষড়যন্ত্রই চলুক না কেন”। (ইসলাম ২০১৭, পৃ ১৩)

৫। বর্তমান পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের প্রেক্ষিতে আগামী দিনের বাংলাদেশ কী হতে পারে? কী হওয়া প্রয়োজন? কীভাবে তা হতে পারে?

পরিতাপের বিষয় যে, বঙ্গবন্ধুকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি। বঙ্গবন্ধু আমাদের অত্যন্ত বেশী ভালবেসেছিলেন এবং বেশী বিশ্বাস করেছিলেন। আমরা সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারিনি। কিন্তু এখন আমরা বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের ঋণ শোধ এবং শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য কী করতে পারি? বলাবাহুল্য, তাঁর ছবিতে কিংবা মাজারে

যেয়ে ফুল দেয়াটাই এর জন্য যথেষ্ট নয়। বঙ্গবন্ধু যেমন "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" রেখে গেছেন। তেমনি রেখে গেছে অসমাপ্ত করণীয়। সে করণীয়র সফল সম্পাদনই হতে পারে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে কী হতে পারে সেই করণীয়?

প্রথমত যেটা করণীয় তা হলো, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাটি এমন করা যাতে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি না পায়। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর একটি পরিমাপ হলো আয় বিতরণের গিনি সহগ, যার মান এখন বাংলাদেশে অনেক পুঁজিবাদী দেশের চেয়ে ঢের বেশী, এবং দিন দিন তা আরও বাড়ছে। বঙ্গবন্ধু এটা মেনে নিতে পারতেন না। কাজেই প্রথমেই যেটা করণীয়, তা হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারাকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা যাতে অসমতা এবং বৈষম্য ক্রমশ হ্রাস পায়।

দ্বিতীয় হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার অবসান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার কুপ্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। বংগবন্ধু বাংলাদেশের এই পরিণতি দ্বারা খুবই বিচলিত হতেন সন্দেহ নেই। ১৯৪৬-এর দাংগার সময় কলকাতায় বঙ্গবন্ধু কীভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানুষকে রক্ষা করায় সচেষ্ট হয়েছিলেন, তার বিবরণ "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"তে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালেও তিনি বারংবার সাম্প্রদায়িক দাংগা প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এহেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান এবং বিস্তার মেনে নেয়া কষ্টকর হতো।

তৃতীয়ত, "বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এবং বাংলাদশের গ্রাম" বইতে আমি দেখিয়েছি যে, ১৯৭৫ সনে দ্বিতীয় বিপ্লবের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু যে সমবায়ী গ্রামের প্রস্তাব করেন, তাতে যৌথচাষ-ই একমাত্র বিষয় ছিল না। বরং তিনি গ্রামকে একটি স্বশাসিত সামাজিক একক হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, যা নিজের উন্নয়নের জন্য স্বীয় সামর্থ্যের ভিত্তিতে নিজে উদ্যোগী হতে পারে। সেজন্য তিনি গ্রামের নিজস্ব আয় ও সম্পদের ভিত্তিতে "গ্রাম তহবিল" গড়ার প্রস্তাব করেছিলেন। কাজেই, সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার কারণে যৌথচাষের প্রস্তাবনা বাদ দিলেও বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রামের প্রস্তাবে অনেক মূল্যাবান উপাদান আছে। বাংলাদেশে বর্তমানে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে একটা শূন্যতা বিরাজ করছে। এই শূন্যতার কারণে বাংলাদেশের গ্রামগুলো আজ অনেকটা এতিমের মতো হয়ে আছে। নির্বাচিত গ্রাম পরিষদ গঠনের দ্বারা উপর্যুক্ত শূন্যতা পূরনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামের এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত এবং গণ-অভিমুখী করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বাংলাদেশের বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা প্রয়োজন।২০১৬ সনে প্রকাশিত *Governance for Development* (Islam 2016) বইতে আমি বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছি কিভাবে আনুপাতিক নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল এবং গণতন্ত্রের মানকে উন্নত করতে পারে। আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যে লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করেছেন, তা পূরণে এগিয়ে যেতে পারি।

চতুর্থত, বঙ্গবন্ধু আজীবন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। একাধিকবার মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু কখনো দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বিত্তশালী হওয়ার চেষ্টা করেন নাই। ধানমন্ডিতে প্লটের জন্যও তিনি দরখাস্ত করতে চান নাই। সেজন্য তিনি স্বাধীনতার পর তাঁর নিজের দলের লোকজনদের দুর্নীতিতে

নিমজ্জিত হতে থেকে পীড়িত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সেনাবাহিনীকেও নামিয়েছিলেন এই দুর্নীতি ও অনাচার রোধ করার জন্য। কাজেই, বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন নিশ্চিত করা একটি করণীয় হতে হবে। কীভাবে তা সম্ভব সে বিষয়েও *Governance for Development* (Islam 2016) বইতে বিস্তারিত আলোচনা পরিবেশিত হয়েছে এবং তা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি।

পঞ্চমত, পরিবেশ এবং প্রকৃতি রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অঙ্গীকার ছিল অসাধারণ। তিনি জেলখানায় থাকতে একটি বড় সময় ব্যয় করতেন বাগান করায়। বংগবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশের জলজ পরিবেশের বড় প্রেমিক। রাজস্থানের যেয়ে তিনি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন কোন জলরাশি না দেখে। "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"তে তিনি জ্যোৎস্নার নীচে সিন্ধিয়া স্টিমার ঘাটের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জন্ম দেয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে পরিবেশ প্রকৃতি, বিশেষত নদ-নদী রক্ষা হবে অন্যতম করণীয়, এবং তার জন্য প্রয়োজন হবে নদ-নদীর প্রতি বর্তমানের "বেড়িবাঁধ পন্থা"র পরিবর্তে "উন্মুক্ত পন্থা"র অবলম্বন। *Rivers and Sustainable Development* (Islam 2020) বইতে আমি বিস্তারিত দেখিয়েছি কেন উন্মুক্ত পন্থাই বাংলাদেশের নদ-নদী এবং প্রকৃতি রক্ষার একমাত্র উপায় ।

ষষ্ঠত, বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধির একটি ফলশ্রুতি হলো, দেশের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার খন্ডীকরণ। যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে একদিকে ধনীদের জন্য ইংরাজি মাধ্যমের ব্যয়বহুল স্কুল-কলেজ গড়ে উঠেছে; অন্যদিকে আমজনতার জন্য রয়েছে বাংলা কিংবা আরবি মাধ্যমের নিম্ন মানের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা। শিক্ষার এই খন্ডীকরণ আবার ফিরতি সম্পর্কসূত্রে আয় বৈষম্যকে আয় বাড়িয়ে দিচ্ছে। এভাবে একটা অশুভ চক্রের সৃষ্টি হয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্যও। অর্থাৎ, জাতি দ্বিখণ্ডিত কিংবা ত্রিখন্ডিত হয়ে গিয়েছে। এক দেশের ভেতর একাধিক সমাজের উদ্ভব ঘটেছে। যে জাতিকে বঙ্গবন্ধু ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, তার এই খণ্ডিত পরিণতি দেখলে তিনি নিশ্চয়ই পীড়িত হতেন। একীভূত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হলো একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের পূর্বশর্ত। সুতরাং, আজ প্রয়োজন একীভূত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জাতিকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করা।

সপ্তমত, নারী, শিশু, এবং যুব সম্প্রদায়ের জন্য বংগবন্ধুর ছিল বিশেষ মমতা। এটা কাকতালীয় নয় যে, ১৭ই মার্চ, বংগবন্ধুর জন্মদিন পালিত হয় শিশু দিবস হিসেবে। তাঁর নিজের জীবনে স্ত্রীর ভূমিকা থেকেই বঙ্গবন্ধু জানতেন পরিবারে এবং সমাজে নারীর ভূমিকা কতো গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। যুব সম্প্রদায় হলো দেশের ভবিষ্যৎ। যুব সমাজ যাতে সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। সেজন্য আগামী দিনের বাংলাদেশে নারী, শিশু, এবং যুব সম্প্রদায়ের কল্যাণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। একই সাথে বাংলাদেশে বসবাসকারী অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীদের যে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে, সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু সচেতন ছিলেন। ছোট-বড় সকল নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা আগামী বাংলাদেশের অন্যতম করণীয়।

অষ্টমত, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জাতীয় এবং জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে বংগবন্ধু বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। সেজন্যই তিনি স্বাধীনতার পরপরই শেল কোম্পানির কাছ থেকে বাংলাদেশের গ্যাস ফিল্ডসমূহ কিনে নেন যাতে তার উপর জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর তিনি

পেট্রো-বাংলা নামে জাতীয় সংস্থা গড়ে তোলেন যাতে জাতীয় সক্ষমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের তেল-গ্যাসের অনুসন্ধান, উত্তোলন, এবং ব্যবহার অর্জিত হতে পারে। পরিতাপের বিষয় যে, পরবর্তী সরকারসমূহ এই নীতি থেকে সরে যেয়ে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমাগতভাবে বিদেশী কোম্পানির হাতে তুলে দিয়েছে। আগামী বাংলাদেশে এই বিপরীত যাত্রা থেকে ফিরে আসতে হবে এবং দেশের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পুনরায় জাতীয় এবং জনগণের অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

নবমত, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীন, নিরপেক্ষ, এবং দেশের স্বার্থ রক্ষাকারী বৈদেশিক নীতির সূচনা করেছিলেন। কোনো বৃহৎ শক্তি অসন্তুষ্ট হবে বলে তিনি কিউবাতে পাট রপ্তানি থেকে বিরত থাকেন নি, যদিও সেজন্য তাঁকে যথেষ্ট মূল্য স্বীকার করতে হয়েছিল। বাংলাদেশকে এরূপ স্বাধীন, দৃঢ়চেতা, স্বীয় স্বার্থ রক্ষাকারী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে হবে।

দশমত, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীসমূহ গড়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। আমজনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের আগের পেশাদার সৈনিকেরা কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে। বঙ্গবন্ধু সবসময় চেষ্টা করেছেন সামরিক বাহিনীসমূহের সাথে জনগণের সম্পর্ক ঘনিষ্ট রাখার জন্য। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সেই জন-সম্পৃক্তি এখন বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। আগামী বাংলাদেশের জন্য অন্যতম করণীয় হবে এই জন-সম্পৃক্তির পুনরুদ্ধার, কেননা সফল জাতি গঠন এবং জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির জন্য এই জন-সম্পৃক্তির খুবই প্রয়োজন।

উপসংহার

সুতরাং, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আগামী বাংলাদেশের জন্য আমি নিম্নরূপ দশ-দফা কর্মসূচি প্রস্তাব করছি।

১) বৈষম্য হ্রাসকারী অর্থনৈতিক উন্নয়ন;
২) অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ;
৩) আনুপাতিক নির্বাচন ও নির্বাচিত গ্রাম পরিষদ গঠন;
৪) দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন;
৫) পরিবেশের সংরক্ষণ এবং নদ-নদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থা অবলম্বন;
৬) একীভূত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা;
৭) নারী, শিশু, এবং যুব সম্প্রদায়ের কল্যাণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ এবং ছোট-বড় সকল নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা;
৮) দেশের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জাতীয় এবং জনগণের অধিকার সুরক্ষা;
৯) স্বাধীন, নিরপেক্ষ, এবং দেশের স্বার্থ-রক্ষাকারী বৈদেশিক নীতি;
১০) সামরিক বাহিনীসমূহের সাথে জনগণের সম্পৃক্তি বৃদ্ধি।

সময় এবং সুযোগমতো আগামীতে এই দফাগুলো আরও ব্যাখ্যা এবং বিস্তৃতি সহকারে পরিবেশ করার আশা রেখে আমার এই বক্তৃতা শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ।

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি অমর হোক!
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক!

নির্দেশিত রচনাবলী

আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৪), *জাসদের উত্থান পতন -- অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (১৯৮১), *জাসদের রাজনীতি – একটি নিকট বিশ্লেষণ*, প্রাচ্য প্রকাশনী, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (১৯৮৪), *বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল প্রসঙ্গ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (১৯৮৭), *বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা – বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকট এবং বিকল্প ধারার প্রশ্ন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (১৯৯৭), "আগামী দিনের বাংলাদেশ – নতুন সহস্রাব্দের সূচনায় স্বদেশ ভাবনা," *সমাজ নিরীক্ষণ,* সংখ্যা ৬৪, পৃ ৩৯-৫০।

ইসলাম, নজরুল (২০১১), *বাংলাদেশের গ্রাম – অতীত ও ভবিষ্যৎ*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (২০১২), *আগামী দিনের বাংলাদেশ*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (২০১৩), *জাসদের রাজনীতি ও আগামী দিনের বাংলাদেশ*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (২০১৫), *পুঁজিবাদের পর কী?* সমাজ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা

Islam, Nazrul S. (2016), *Governance for Development – Political and Administrative Reforms in Bangladesh*, Palgrave Macmillan, New York.

ইসলাম, নজরুল (২০১৭), *বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম*, ঈস্টার্ণ একাডেমিক, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (২০১৯), *অক্টোবর বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ,* ঈস্টার্ণ একাডেমিক, ঢাকা

Islam, Nazrul S. (2020), *Rivers and Sustainable Development: Alternative Approaches and Their Implications*, Oxford University Press, New York

Islam, Nurul (1979), *Development Planning in Bangladesh: A Study in Political Economy*, University Press Limited, Dhaka

Islam, Nurul (2017), *An Odyssey: The Journey of My Life*, Prothoma Prokashan, Dhaka

পেয়ারা, শামসুদ্দিন আহমেদ (২০১৯), *আমি সিরাজুল আলম খান – একটি রাজনৈতিক জীবনালেখ্য*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

Rahman, Md. Anisur (1974), "Priorities and Methods for Socialist Development of Bangladesh," in E. A. G. Robinson and Keith Griffin (eds.), *The Economic Development of Bangladesh within a Socialist Framework,* Proceedings of the Conference held by the International Economic Association at Dhaka, Macmillan Press Ltd., London (1974), pp. 16-26

Rahman, Md. Anisur (2001), *My Story of 1971: Through the Holocaust that Created Bangladesh*, Liberation War Museum, Dhaka

রহমান, মোঃ আনিসুর (1998), *যে আগুন জ্বলেছিল – মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ*, গণপ্রকাশনী, ঢাকা

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২), *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১৭), *কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০২০), *আমার দেখা নয়াচীন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সেন, বিনায়ক (২০২০-২০২১), বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র – বাহাত্তরের সংবিধান ও সমতামুখী সমাজের আকাঙ্ক্ষা, কালের খেয়া, *দৈনিক সমকাল*, ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত

Sobhan, Rehman and Muzaffer Ahmed (1980), *Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study in the Political Economy of Bangladesh*, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), Dhaka

অন্ত্যটীকা

[i] বৈঠকটির আয়োজনে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক বজলুর রহমান।

[ii] ইউরোপে আধুনিককালের রাষ্ট্রসমূহ ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হয় নি। এমনকি, মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহও (একমাত্র ইসরাইল বাদে) ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত নয়।

[iii] যে কারণে একটা পর্যায়ে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিল।

[iv] মুক্তিযুদ্ধের আগে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় চিত্তরঞ্জন সুতারের (ভবানীপুরের রাজেন্দ্র রোড) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এখানেই নিহিত। আওয়ামীলীগ এবং ছাত্রলীগের যেসব ইয়াং টার্করা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন সরকারের এখতিয়ারের বাইরে যেয়ে মুজিব বাহিনী গঠন করেছিল, তারা চিত্তরঞ্জন সুতারের মাধ্যমেই ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল বলে ধারণা করা হয়। সিরাজুল আলম খানের ভাষ্য অনুযায়ী চিত্তরঞ্জন সুতারের ভবানীপুরের রাজেন্দ্র রোডের ঠিকানাটিই বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চের কালরাত্রির প্রাক্কালে তাদেরকে মুখস্থ করিয়েছিলেন (পেয়ারা ২০১৯)। তবে চিত্তরঞ্জন সুতারের মাধ্যমে স্থাপিত এই যোগাযোগের বিষয়ে কেন তাজউদ্দীনআহমেদ আড়ালে ছিলেন, সেটি একটি পৃথক প্রশ্ন।

[v] কেননা বিপথগামী জাসদের সদস্যদের পথে আনার সেটাই ছিল অপেক্ষাকৃত সম্ভাব্য পথ; কোন ষড়যন্ত্রের কথা তাদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব হতো না।

[vi] যদিও প্রণিধানযোগ্য যে, বঙ্গবন্ধু উপরিদ্ধৃত কথাগুলো বলছিলেন এমন সময় যখন তিনি প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের একদলীয় যে রাজনৈতিক মডেল, সেটাই তিনি অবশেষে বাংলাদেশে প্রবর্তন করছিলেন। যাহোক, অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র যে তার নিজস্ব পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বকীয় বৈশিষ্টমণ্ডিত হতে হবে, বঙ্গবন্ধুর এই চিন্তাটি বাকশাল গঠনের আগেও ছিল।

[vii] এই বইটির একটা পূর্বারম্ভ ছিল ১৯৮৪ সনে প্রকাশিত বাংলাদেশের উন্নইয়ন কৌশল প্রসঙ্গ (ইসলাম ১৯৮৪) বইটিতে।